জলরঙের রাজপুত্র : শ্যামল দত্ত রায়

দেবকুমার সোম এবার কলমে ধরেছেন বিস্মৃত এক শিল্পীকে। ব্রিটিশ চিত্রশিল্পী টার্নারের যোগ্য ভারতীয় উত্তরসূরী শ্যামল দত্ত রায়ের কথা এই স্বল্পদৈর্ঘ্যের লেখায়।

যে রং সহজলভ্য, আবার সহজেই জলে গুলে যায়, সেই রং আমাদের শৈশবকে কল্পনায় রাঙিয়ে রাখে। আমাদের প্রায় প্রত্যেকের জীবনে জল আর রঙের দ্রবীভূত হওয়ার এমন আশ্চর্য শৈশব আছে। যখন রং জলে গুলে তুলি দিয়ে সাদা পৃষ্ঠায়, কিংবা দেওয়াল বা কাপড় রঞ্জিত করেছি মনের আনন্দে। মনের ভেতরে ডুবে থাকা দৈত্য-দানো থেকে পঙ্খীরাজ, পালতোলা সাদা মেঘ, সব তখন রং-তুলিতে মাখামাখি। রঙের এই জলে মিশে যাওয়ার অবাক-করা গুন আমাদের তুলিতে উঠে আসে লাল-হলুদ-নীল হয়ে। অথচ, সার্থক চিত্রকলায় জলরঙের ভূমিকা প্রায় অকিঞ্চিৎকর। দু-একজন ব্যতিক্রমী বাদ দিলে জলরঙে ছবি আঁকেন না কোন চিত্রী। কারণ? কারণ জলরঙের সীমাবদ্ধতা।

তবুও কেউ কেউ এই সীমাবদ্ধতা পার করে জলরঙে তাঁদের শিল্পের সাক্ষর রেখে যান। আধুনিক ভারতের চিত্রকলায় তেমনই এক ব্যতিক্রমী নাম শ্যামল দত্ত রায়।

সম্ভবত প্যাপিরাসের সময় থেকে জলরঙের ব্যবহার শুরু হয়। ধর্মগ্রন্থ কিংবা রাজ-ফরমানের চারপাশ সুন্দর করে অলঙ্করণ হত তখনকার জলরঙে। পরবর্তী সময়ে রেনেসন্সের যুগে জলরঙের প্রচলন চিত্রশিল্পে বেড়ে ছিল। জলরঙের অসুবিধা এই যে, জলরঙের ছবিতে একবার ভুল হলে সেটাকে সংশোধন করা প্রায় যায় না। জলরঙের কাজ করতে হলে পুরো পরিকল্পনাটাকে মাথার মধ্যে স্পষ্ট করে নিতে হয়। মকশো করার উপায় নেই। সাদা কাগজের ওপর বিভিন্ন রং চাপিয়ে কাগজের সাদা রঙটাকে ফুটিয়ে তুলতে হয়। অনেকটা এলিমিনেশন পদ্ধতি। ফলে জলরঙের প্রাচীন টেকনিক হল ওয়াশ। অর্থাৎ প্রথমবার রং চাপিয়ে ধুয়ে ফেলতে হয়। তারপর তার ওপর আবার এক কোট রং চাপাতে হত। সেটাও ধুয়ে ফেলে তৃতীয় রং চাপত। ফলে শেষ যে রঙটা কাগজে থাকত, সেটাই হয়ে উঠত মুখ্য। আর তার পেছন থেকে ফুটে

উঠত আগের চাপানো রং। অবনীন্দ্রনাথের *শাজাহানের মৃত্যু* এমনই জলরঙের একটি কালজয়ী কাজ। আমাদের দেশে নব্যবঙ্গ ধারায় জলরঙের কাজ শুরু হয়। কলাভবনে আচার্য নন্দলাল জলরঙের কাজ শেখাতেন ছাত্রদের। সেখানে তেলরঙের ব্যবহার ছিল নিষিদ্ধ। নন্দলালের দুই কিংবদন্তী ছাত্র রামকিংকর আর বিনোদবিহারী ছিলেন জলরঙের সার্থক শিল্পী। টেকনিক্যাল কারণেই জলরঙে ছবির বৈচিত্র আনা প্রায় অসম্ভব ছিল। ল্যান্ডস্কেপ ছাড়া সে সময় প্রায় অন্য কোন কাজ করা যেত না। কারণ রঙের পরত, বুনেট, বিভিন্ন শেড জলরঙে আনা সম্ভব ছিল না। ব্রিটিশ চিত্রকর জোসেফ টার্নার প্রথম এই মাধ্যমে বিপ্লব এনেছিলেন। দিনের অধিকাংশ সময় তিনি টেমসের ধারে বসে থাকতেন আর দেখতেন টেমসের জলের ওপর আলোর বিবিধ খেলা। এই আলোর ব্যবহার আনার জন্য জলরঙের সাবেক টেকনিক তিনি পাল্টে ফেললেন। ওয়াশের বদলে রঙ চাপানো। অর্থাৎ আলোর সঠিক ব্যবহারের জন্য প্রথমে হালকা রং। তারপর একটু গাঢ় রং চাপলো। তারপর আরও গাঢ়। ফলে অয়েল কিংবা টেম্পেরার মতো এফেক্ট এল টার্নারের ছবিতে। শ্যামল দত্ত রায় টার্নারের টেকনিককেই আরও উন্নত করে রচনা করলেন চিত্রশিল্পের নতুন ভুবন। পেলেন ভারতের জলরঙের রাজপুত্রের সম্মান।

কিন্তু কেমনভাবে তিনি ব্যতিক্রমী হয়ে উঠলেন? কেবলমাত্র জলরঙের টেকনিকের জন্যই কি তিনি আলোচিত থাকবেন? তাঁর চিত্রসম্ভারের বিষয়বস্তুই তাঁকে জলরঙে স্থিত করল? এসব প্রশ্নের জুতসই উত্তর জানা প্রয়োজন। ভারতের আধুনিক চিত্রকলায় শ্যামল দত্ত রায়ের ভূমিকা, সমসাময়িক চিত্রকলায় তাঁর প্রভাব এসব আলোচনার মধ্যে দিয়েই হয়ত এসব প্রশ্নের উত্তরগুলো খুঁজে পাওয়া যাবে। শ্যামল দত্ত রায় যে সময় গর্ভমেন্ট আর্ট স্কুলে ভর্তি হন, সেই ১৯৪৯ সাল তিনি সহপাঠী হিসেবে পান নিখিল বিশ্বাস, প্রকাশ কর্মকার, সনৎ কর, সুধীর বৈরাগী, সুবোধ বসু প্রমুখকে। সে বছর খাদ্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে সাতজন আন্দোলনকারী মারা যান। তখন রাজ্যপাল কৈলাশনাথ কাটজু। আর্ট কলেজের বাৎসরিক শিল্প প্রদর্শনী উদ্বোধনের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ রাজ্যপালকে আমন্ত্রণ জানালে ছাত্ররা প্রতিবাদ করেন। তাঁরা রাজ্যপালের পরিবর্তে যামিনী রায়কে আমন্ত্রণের প্রস্তাব দেন। ফলে ছাত্র ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে সংঘাত

বাধে। প্রদর্শনী বন্ধ হয়ে যায়। কর্তৃপক্ষ প্রতিশোধ নেন উঁচু ক্লাসের ছাত্র বিজন চৌধুরী, শীতেশ চৌধুরী, তাপস দত্তদের বহিষ্কার করে। আর প্রথম বর্ষের ছাত্র নিখিল বিশ্বাস, প্রকাশ কর্মকার, শ্যামল দত্ত রায়দের ফেল করিয়ে। ফলে আর্ট কলেজের শিক্ষকদের সম্বন্ধে শ্যামলের কখনও শ্রদ্ধা বা অনুরাগ জন্মায়নি। ব্যতিক্রম গোপাল ঘোষ ও অনিল ভট্টাচার্য। শৈশব থেকেই শ্যামলের মধ্যে জলরঙের প্রতি টান ছিল অমোঘ। অথচ, আর্ট কলেজের বিষয়সূচিতে জলরঙের কোন গুরুত্ব ছিল না। ছাত্ররা কাজ চালানোর মতো টেকনিক কিছু শিখতেন মূলত বড়ো কাজের মিনিয়েচার কপি তৈরি করার জন্য। কিংবা ছবির প্রাথমিক খসড়া বানানোর জন্য। ফলে জলরঙের কাজ দেখা ও শেখার জন্য তখন শ্যামলকে বারবার শান্তিনিকেতনে ছুটতে হত। সেখানে তখন জলরঙের কাজ শেখাতেন নন্দলাল ও তাঁর দুই ছাত্র রামকিংকর ও বিনোদবিহারী। শ্যামল দত্ত রায় তাঁর শিক্ষক হিসেবে এই তিনজনকেই মান্যতা দিয়েছেন।

কিন্তু নিসর্গ আঁকা তাঁর অভিরুচি ছিল না। তাঁর বন্ধুরা তখন যন্ত্রণা, বিক্ষোভ, বিদ্রোহের ছবি আঁকছেন। অর্থনৈতিকভাবে প্রায় নিঃস্ব এই শহরের স্বপ্নদেখা তরুণ চিত্রশিল্পীদের মধ্যে তিনিও ছিলেন অন্যতম। তখন ছবি এঁকে পেট চালানোর কথা ভাবা যেত না। শহরে ছবির প্রদর্শনী কিংবা ছবি নিয়ে চর্চার কোন পরিবেশও ছিল না। দেশভাগের পরবর্তী দু-দশকে উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য সংকট, ভারত-চিন, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, কালোবাজারি, অসাধু রাজনীতিতে জেরবার মানুষ। দেশভাগের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা যে কোন সমাধান দিল না তা তখন দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। সরকার বৃহৎ পুঁজিপতিদের দোসর। কমিউনিস্টরা ভেঙে তিন টুকরো। সমাজবিরোধী আর পুলিশ প্রশাসন তখন সমার্থক। সেই সময় দাঁড়িয়ে শ্যামলের মনেও জন্ম নিয়েছিল বিক্ষোভ। বিদ্রোহ। তখন বন্ধুরা এক হয়ে শিল্পীগোষ্ঠী তৈরি করছেন। নিজেদের হিম্মতে ছবির প্রদর্শন করছেন। এই সময় শ্যামল দত্ত রায় গ্রাফিক্সের কাজে মন দিয়েছিলেন। কারণ, সেই ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে টেকনিক নয়, বিষয়টাই ছবি হয়ে উঠেছে। নিখিল বিশ্বাস, প্রকাশ কর্মকারদের মতো তাঁরও অর্থনৈতিক অবস্থা প্রায় নিরন্নের মতো। এর মধ্যে ঘটে যায় পারিবারিক এক শোক। মাত্র বাইশ বছর বয়সী ছোট বোন মারা যায় কিডনির অসুখে। যে অসুখে আক্রান্ত হয়ে একেবারে ছোটবেলায় শ্যামল নিজেই ছিলেন গৃহবন্দী।*ডাকঘর*-এর অমলের মতো ছিল তাঁর শৈশবের জীবনযাপন। ছোটবোনকে হারিয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পরেন শ্যামল। এরই মধ্যে এল

নতুন এক উৎপাত। তেলরঙে তাঁর চামড়ার এলার্জি ধরা পড়ল। তিনি বাধ্য হলেন জলরঙে ফিরে যেতে। কিন্তু এই ফিরে যাওয়াটা কেমন ছিল?

জলরং মানেই তখন বিনোদবিহারীর নিসর্গ। গগনেন্দ্রনাথের *দেবী বিসর্জন* । রামকিংকরের *বিনোদিনী* । ড্রয়িংরুমের ছবি তো তিনি আঁকতে চান না। তাঁকে আঁকতে হবে যুগযন্ত্রণার ছবি। টার্নারের মতো টেমসের জলে আলোর খেলা আঁকার রহস্যমেদুরতা ১৯৬০-এর দশকে কলকাতা শহরে কারও কাম্য হতে পারে না। শ্যামলকে আঁকতে হবে হাড় জিরজিরে কঙ্কালসার মানুষ। তাঁকে আঁকতে হবে তাঁদের রাঁচির বাড়ির পেছন দিকে চালর্স সাহেবের ভেঙে যাওয়া অট্টল। এই শহর কলকাতায় ভেঙে পড়া ঔপনিবেশিক সভ্যতার মধ্যে ভাঙা ভিক্ষাপাত্র। যে ভিক্ষাপাত্র স্বয়ং ঘোষণা করছে ভিক্ষা পাওয়ার যোগ্যতাও হারিয়েছে এই নগর। নগরের মানুষ। কিন্তু জলরঙের সাবেক টেকনিকে এই আলো-অন্ধকার কীভাবে ধরা দেবে? তাঁর সতীর্থ গণেশ পাইন টেম্পেরায় যে যুগ যন্ত্রণার কথা চিত্রিত করছেন। তাঁর বন্ধু প্রকাশ কর্মকার তেলরঙে যে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, সদ্যপ্রয়াত প্রিয় বন্ধু নিখিল বিশ্বাস যেভাবে *ক্রাইস্ট* এঁকে গেছেন। তেমনটাই হবে তাঁর বিক্ষোভ। কিন্তু জলরঙে। এখানে আর একটা কথাও রয়ে গেছে। প্রকাশ কিংবা নিখিলের মতো নয় তাঁর জীবনযাপন। তিনিও বিক্ষুব্ধ এক সত্ত্বা। কিন্তু সেই বিক্ষোভ অনেক অন্তর্লীন। যেভাবে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পার্থক্য থেকে যায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের। যেভাবে ফাল্গুনি রায়ের কবিতার সঙ্গে আপাত বিরোধ থেকে যায় ভাস্কর চক্রবর্তীর, অনেকটা ভেমনই তফাত নিখিল-প্রকাশের চিত্রভাষার সঙ্গে শ্যামলের চিত্রভাষার। ফলে শ্যামলের ছবিতে উঠে এল হলুদের ধুসরতা। মরা মাছের মতো দৃষ্টি। ভাঙা ঘরবাড়ি। কঙ্কালসার মানুষ কিংবা পশু। মাথার ওপর সাদা পাখি। ভিক্ষাপাত্র ঘিরে ঝাঁকে ঝাঁকে কাক। না, নারী শরীরের রহস্যময়তা তাঁর ছবির বিষয় হয়নি।

শৈশবে একা একা থাকার সময় হাড় জিরজিরে শ্যামল খালি গায়ে, মাথায় রাঙতার মুকুট পড়ে ভাঙা চেয়ারে বসে রাজা-রাজা খেলতেন। সেই হাড় জিরজিরে বাচ্চা ছেলেটা

অবিকল মরা মাছের চোখ, মাথায় রাঙতার মুকুট ১৯৭০-এর দশকে উঠে এল তাঁর ক্যানভাসে। ভাঙা পুরোনো দিনের মোটর কার। ঋত্বিককুমার ঘটকের *অযান্ত্রিক* ছায়াছবির জগদ্দল এল তাঁর ক্যানভাসে। মোটর কারের সামনে পড়ে একটা ভাঙা ভিক্ষাপাত্র। এল মাদার টেরেসার প্রসঙ্গ। সেল্ফ পোর্ট্রেটে ফ্রেমেবাঁধা ছবির মধ্যে তিনি। আর ছবির ফ্রেমে রজনিগন্ধার মালা অবিন্যস্ত। আঁকলেন কালীমন্দিরে বলি হওয়ার আগে পাঁঠা। ছবির সব বিষয়বস্তু ছাপিয়ে দর্শকের বুকে কাঁপন ধরায় পাঁঠার চোখের দৃষ্টি। হ্যাঁ, এগুলো সবই জলরঙে সৃষ্টি। জলরঙের যাবতীয় সীমাবদ্ধতাকে তিনি শক্তিতে পরিণত করে দিয়েছেন। আর নিজেকে আধুনিক ভারতের অন্যতম উল্লেখযোগ্য এক শিল্পী হিসেবে প্রস্থাপিত করেছেন।

চিত্রী শ্যামল দত্ত রায়ের কাজ নিয়ে শিল্পবেত্তা সমালোচকেরা আলোচনা করবেন। আমার মতো এক ছবি-মূর্খের সে সব কথা বলা পাপ। আমি শুধু এটুকুই বলি, শিল্প সৃষ্টির জন্য কেউ যদি নিজের সীমাবদ্ধতাকে তাঁর শক্তিতে পরিণত করতে চান, তবে শ্যামল দত্ত রায়ের জীবনকে অনুশীলন করতে পারেন।